লোক প্রশাসন সাময়িকী
৮ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৭, চৈত্র ১৪০৩

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগ ও নির্বাচন ঃ একটি পর্যালোচনা

খন্দকার নাইমুল ইসলাম *

১.০ ভূমিকা

১.১ কর্মী ব্যবস্থাপনা তথা যে কোন সংগঠন/প্রশাসন পরিচালনা ক্ষেত্রে কর্মী নিয়োগ ও নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংগঠনিক/প্রশাসনিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করতে প্রয়োজন কর্মী। প্রশাসন তথা সংগঠনের চাহিদা পূরণের জন্য উপযুক্ত দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু ও কার্যকর নিয়োগ ও নির্বাচন নীতি, পদ্ধতি। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে ক্যাডার নিয়োগ ও নির্বাচনের পদ্ধতি এবং এক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যাবলী আলোচনা করা হয়েছে এবং তা দূরীকরণে কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে।

১.২ "Good people are hard to find, hard to develop and hard to keep"-Anon.

কর্মচারী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কর্মী নিয়োগ। সাংগঠনিক কার্যক্রমের যথোপযুক্ত লক্ষ্য অর্জনে, দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার, সর্বোপরি সাংগঠনিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সুষ্ঠুতা বজায় রাখতে কর্মী নিয়োগ একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া। যে কোন সামাজিক সংগঠনের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম অব্যাহত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যথোপযুক্ত কর্মী নিয়োগের মাধ্যমেই সংগঠন শুধু তার সচলতা বজায় রাখতে পারে। সাংগঠনিক কার্যক্রমে কর্মী নিয়োগ তাই কর্মচারী ব্যবস্থাপনার অন্যতম মৌল বিষয়। অপরাপর সামাজিক সংগঠনের মতো সরকারি কার্যক্রমের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য কর্মী নিয়োগ প্রয়োজন। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে কেন্দ্র থেকে স্তরভিত্তিক প্রান্তিক প্রশাসনিক ইউনিট বা একক গুলিতে সরকার তার বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্নমূখী রাজস্ব ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত। অপরাপর উন্নয়নশীল দেশগুলিরমত বাংলাদেশেও সরকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সিংহভাগই নিজে রাখতে বাধ্য হচ্ছে বিকল্প পূজি এবং ব্যক্তি খাতের আশানুরূপ বিকাশের অভাবে। এই দিক থেকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কর্মী নিয়োগ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

১.৩ উপরন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার মূল চালিকা শক্তি হলো প্রশাসন। আর এই

* প্রভাষক, লোক প্রশাসন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশাসনের সুষ্ঠু পরিচালনা নির্ভর করে উপযুক্ত এবং দক্ষ কর্মীর উপর, যা কর্মী নিয়োগের মাধ্যমেই শুধুমাত্র পূরণ সম্ভব। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই 'মূল চালিকা শক্তি' ধারণাটি অধিকতর দ্যোতনা বহন করে, কারণ অস্থিতিশীল রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক মূলবোধের অভাব, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি অনুশীলনের ধারাবাহিকতা- হীনতা ইত্যাদি এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক সীমাবদ্ধতার কারণে এখানে প্রশাসনের ওপর সরকারের নির্ভরশীলতা অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী। এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কর্মী নিয়োগ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

২.০ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য

কর্মী নিয়োগ কর্মচারী ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে সরকারী প্রশাসনে কর্মী নিয়োগ অধিকতর গুরুত্ব বহন করে বিরাজিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা, মূলত ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও নির্বাচন পদ্ধতি আলোচনা করবো। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো ঃ

১. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রথম শ্রেণীর ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ নিয়োগ পদ্ধতি পর্যালোচনা,

২. প্রত্যক্ষ কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতিগত ও পদ্ধতিগত সমস্যাগুলির স্বরূপ নির্ধারণ এবং

৩. এক্ষেত্রে কিছু সুপারিশ প্রস্তাব প্রণয়ন।

৩.০ তথ্য সংগ্রহ

৩.১ বর্তমান প্রবন্ধ মূলত মাধ্যমিক তথ্য ভিত্তিক। প্রবন্ধের তথ্য সংগ্রহে প্রধানত সরকারের নিয়োগ সম্পর্কিত বিভিন্ন সার্কুলার, ম্যানুয়াল, বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত রিপোর্ট, বাংলাদেশের নিয়োগ সম্পর্কিত অন্যান্য প্রকাশনা ও বিভিন্ন গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকমিশনের একজন সাবেক সচিবের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। 'প্রার্থী পুল' গঠন করা হয়। ষষ্ঠ স্তরে 'প্রার্থী পুল' থেকে চূড়ান্তনিয়োগ কল্পে বাছাইকরণ করা হয়। সপ্তম স্তরে পূর্ববর্তী সকল নিয়োগ কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়।

৪.০ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কর্মী নিয়োগ ও নির্বাচনঃ পটভূমি ও পদ্ধতি

৪.১ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত কর্মীরা চারটি সাধারণ শ্রেণীতে বিভক্ত। এই চারটি শ্রেণীকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী হিসেবে অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন সার্ভিসের এই চারটি শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ পদ্ধতি অভিন্ন নয়। ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রণালয়, বোর্ড, সংস্থা এই সকল নিয়োগ সংক্রান্ত কার্য

পরিচালনা করে বিভিন্ন নীতি অনুসারে। এখানে উল্লেখ্য যে, সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মাঝে নন ক্যাডার বা ক্যাডার বহির্ভূত কর্মকর্তাও আছেন এবং তাদের নিয়োগ পদ্ধতিও ক্যাডার কর্মকর্তাদের থেকে ভিন্ন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা মূলত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রথম শ্রেণীর ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ পদ্ধতিই আলোচনা করবো। সিভিল সার্ভিসের এই প্রথম শ্রেণীর পদগুলি কনিষ্ঠ জুনিয়র ব্যবস্থাপকীয় পদ থেকে শুরু করে নীতি নির্ধারণী উচ্চ পদ পর্যন্ত বিস্তৃত।

৪.২ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে বর্তমানে ২৯টি ক্যাডার রয়েছে। তাদের নাম নিম্নে দেয়া হলো ঃ (Ahmed; 1990:160) ১। বি. সি. এস. (প্রশাসন) ২। বি. সি. এস. (খাদ্য) ৩। বি. সি. এস. (সমবায়) ৪। বি. সি. এস. (কৃষি) ৫। বি. সি. এস. (বন) ৬। বি. সি. এস. (মৎস্য) ৭। বি. সি. এস. (গবাদি ও পশুপালন) ৮। বি. সি. এস. (সাধারণ শিক্ষা) ৯। বি. সি. এস. (কারিগরী শিক্ষা) ১০। বি. সি. এস. (অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যঃ অর্থনৈতিক) ১১। বি. সি. এস. (অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যঃ বাণিজ্য) ১২। বি. সি. এস. (অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যঃ পরিসংখ্যান) ১৩। বি. সি. এস. (প্রকৌশলঃ গণপূর্ত) ১৪। বি. সি. এস. (প্রকৌশল ঃ জন স্বাস্থ্য) ১৫। বি. সি. এস. (প্রকৌশলঃ সড়ক ও জনপথ) ১৬। বি. সি. এস. (প্রকৌশলঃ টেলিযোগাযোগ) ১৭। বি. সি. এস. (হিসাব ও নিরীক্ষণ) ১৮। বি. সি. এস. (শুল্ক ও আবগারী) ১৯। বি. সি. এস. (কর) ২০। বি. সি. এস. (পররাষ্ট্র) ২১। বি. সি. এস. (স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাঃ স্বাস্থ্য) ২২। বি. সি. এস. (স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাঃ পরিবার পরিকল্পনা) ২৩। বি. সি. এস. (তথ্য) ২৪। বি. সি. এস. (বিচার সংক্রান্ত) ২৫। বি. সি. এস. (ডাক) ২৬। বি. সি. এস. (পুলিশ) ২৭। বি. সি. এস. (আনসার) ২৮। বি. সি. এস. (রেলওয়েঃ পরিবহন ও বাণিজ্যিক) ২৯। বি. সি. এস. (রেলওয়েঃ কারিগরী)।

৪.৩ ১৯৭৬ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পদে কর্মী নিয়োগের উদ্দেশ্যে বিস্তারিত নিয়োগ সংক্রান্ত আইন প্রণীত। এই নীতির ভিত্তিতেই বর্তমানে সিভিল সার্ভিসে কর্মকর্তা পর্যায়ে নিয়োগ কার্যকর হচ্ছে। কর্মকর্তা পর্যায়ে নিয়োগে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে প্রধানত তিনটি পদ্ধতির ব্যবস্থা রয়েছে (বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন; ১৯৯৫ঃ ৯)। এগুলি হলো ঃ (ক)সরাসরি নিয়োগ (খ) পদন্নোতির দ্বারা নিয়োগ (গ) বদলী বা প্রেষণে নিয়োগ, এছাড়া (ঘ) এডহক নিয়োগ (ঙ) মৌসুমী নিয়োগ (চ) খন্ডকালীন নিয়োগ (ছ) উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের আত্মীকরণ (জ) ল্যাটারাল এন্ট্রি প্রভৃতি পদ্ধতিতেও উচ্চতর পর্যায়ে কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থী মনোনয়ন নিম্নলিখিত চারভাবে হয়ে থাকে। (বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন; ১৯৯৫ঃ৯) ১। প্রতিযোগিতামূলক প্রিলিমিনারী লিখিত পরীক্ষা এবং পরবর্তী মনস্তাত্ত্বিক ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্ত নির্বাচন। ২। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাছাই পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা, ও

সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে নির্বাচন। ৩। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাছাই পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে নির্বাচন। ৪। শুধু সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নির্বাচন। যদিও সিভিল সার্ভিসের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পর্যায়ের নিয়োগের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত প্রতিটি প্রক্রিয়াই সক্রিয়, কিন্তু প্রবেশ পর্যায়ের ক্যাডার কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রথম প্রক্রিয়াটিই কার্যকর, এবং বলা বাহুল্য এটিই বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রধান নিয়োগ প্রক্রিয়া।

৫.০ সরাসরি নিয়োগ

৫.১ সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতিতে চার স্তর বিশিষ্ট প্রতিযোগিতামূলক প্রিলিমিনারী টেষ্ট, লিখিত পরীক্ষা এবং পরবর্তী মনস্তাত্ত্বিক ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ ক্ষেত্রে সাংবিধানিক শর্তাবলে সরকারি কর্ম কমিশন ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের এক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব হল চাকরি সংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান প্রণয়ন ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের এক্ষেত্রে দায়িত্ব হচ্ছে কর্মকর্তাদের নিয়োগ কল্পে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার, পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন ইত্যাদি। তবে এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার শুরু হতে শেষ পর্যন্ত একাধিক মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সক্রিয় থাকে।

চিত্র ঃ বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসে কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা

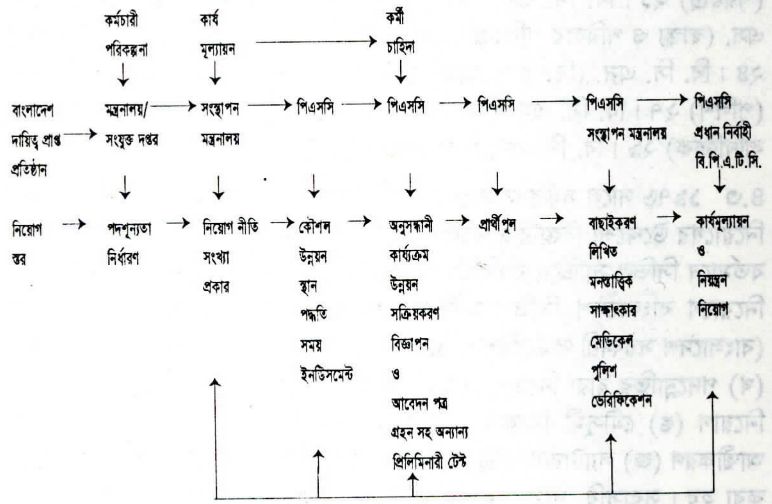

৫.২ নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রথম স্তরে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর তাদের প্রয়োজনীয় জনশক্তি চাহিদার দাবী সম্পর্কে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে। সকল মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য দপ্তর, অধিদপ্তর প্রভৃতির চাহিদা অবহিত হবার পর

সংস্থাপন মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে জনশক্তি চাহিদার সংশোধনীসহ সরকারি কর্মকমিশনে প্রেরণ করে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে শূন্য পদ সম্পর্কে নির্দেশনা পাবার পর কর্মকমিশন পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্বাচন পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য পরীক্ষার্থীদের অবহিত করে। এ পর্যায়ে পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল প্রস্তুতি ও প্রাসঙ্গিক কার্য;যেমন মোট শূন্য পদ, ক্যাডার সমূহের নাম, পরীক্ষার সিলেবাস, পরীক্ষার তারিখ, স্থান, পরীক্ষার জন্য প্রবেশপত্র, ফর্ম বিতরণ, ফী গ্রহণ ইত্যাদি কর্ম কমিশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। সরকারী কর্মকমিশনের অধীনে এই নির্বাচনী পরীক্ষা চারটি স্তরে বিশিষ্ট, যথাঃ ১। প্রিলিমিনারী টেষ্ট ২। লিখিত পরীক্ষা ৩। মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা ৪। মৌখিক পরীক্ষা।

৫.৩ প্রিলিমিনারী টেষ্ট

আবেদনকারী সকল প্রার্থীর মধ্য থেকে উপযুক্ত প্রার্থীদের নিয়ে একটি বাছাই পরীক্ষা হয়। এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১০০ নম্বরের মধ্যে এমসিকিউ (MCQ) প্রকৃতির প্রশ্ন পদ্ধতিতে। এই পরীক্ষার উত্তীর্ণ প্রার্থীরা লিখিত মূল পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হন। বিসিএস পরীক্ষার পদ অনুপাতে আবেদন কারীর সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়াতে ১৯৮৯ সাল থেকে এই বাছাই পরীক্ষা প্রচলন করা হয়। এই পরীক্ষায় শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ক্রীড়া, সাম্প্রতিক বিশ্ব, বিশ্ব রাজনীতি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান মূলক প্রশ্ন থাকে। তবে এই পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত কোন পাশ নম্বর নেই। সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর থেকে পদ অনুপাতে পরীক্ষার্থীদের পরবর্তী পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হয়।

৫.৪ লিখিত পরীক্ষা

১৯৮৫ সালে অনুমোদিত বিধি অনুসারে বর্তমানে ১০০০ নম্বরের বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি চালু আছে (সরকারী কর্ম কমিশন; ১৯৯৫ঃ ১৯)। প্রিলিমিনারী টেষ্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের এ পরীক্ষার সুযোগ দেয়া হয়। লিখিত পরীক্ষায় ৫০০ নম্বরের আবশ্যিক ও ৩০০ নম্বরের ঐচ্ছিক বিষয় সহ মোট ৮০০ নম্বর রয়েছে। লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা, ইংরেজী, সাধারণ গণিত, দৈনন্দিন বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী এই পাঁচটি আবশ্যিক বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রভৃতির স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বিষয়গুলি থেকে ঐচ্ছিক বিষয় বেছে নেবার সুযোগ রয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত সময় ৩ ঘন্টা।

ক) আবশ্যিক বিষয়গুলির সাধারণ নম্বর বন্টন নিম্নরূপ ঃ (সরকারি কর্ম কমিশন; ১৯৯৪) সাধারণ বাংলা-রচনামূলক ৩০, ভাব সম্প্রসারণ ১৫, ভাব সংক্ষেপ/সারমর্ম ১৫ এবং অশুদ্ধি সংশোধন, শূন্য স্থান পূরণ, বাগধারা-বাগবিধির ব্যবহার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত প্রশ্নের মাল্টিপল চয়েস ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রভৃতি সম্মিলিত ভাবে ৪০ নম্বর, সর্বমোট ১০০।

খ) সাধারণ ইংরেজী-রচনামূলক প্রশ্ন অর্থাৎ Essay-30, Amplification of ideas-15, Substance/Precis writing-15 and Correction of errors in composition, Use of idioms and phrases, Fill in the blanks, Multiple choice and short answers, questions on English language & Literature etc. jointly 40. Total=100

গ) সাধারণ জ্ঞান ঃ ৩০০

এক্ষেত্রে দুটি অংশ; প্রথম, বাংলাদেশ প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী, দ্বিতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী। বাংলাদেশ অংশে রয়েছে বাংলাদেশের (১) ভূমি ও জনগণ (২) ঐতিহাসিক পটভূমি, (৩) সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমি (৪) বাংলাদেশের সংস্কৃতি (৫) শিল্প ও সাহিত্য (৬) বৈদেশিক নীতি (৭) সরকারঃ নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ (৮) সংবিধান (৯) প্রশাসনিক কাঠামো (স্থানীয় সরকার সহ) (১০) প্রজতন্ত্রের সরকারী চাকরি, (১১) বিভিন্ন অর্থনীতি (১২) প্রশাসনিক (১৩) প্রশাসনিক ও ভূমি সংস্কার। সাধারণ জ্ঞানের নম্বর বন্টন নিম্নরূপঃ রচনামূলক-৬০ এবং সংক্ষিপ্ত ও মাল্টিপল চয়েস প্রকৃতির প্রশ্ন- ৪০, মোট ১০০।

ঘ) আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হলো; জাতিসংঘ, উত্তর আটলান্টিক চুক্তি ও পশ্চিম ইউরোপীয় নিরাপত্তা বিষয়াবলী, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও আন্দোলনের এজেন্ডা সমূহ, পশ্চিমা উন্নত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয়ান কমিউনিটিভুক্ত দেশগুলি, জাপান, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশের পররাষ্ট্র নীতি, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, উত্তর মধ্য ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির দ্বন্দ্ব ও আঞ্চলিক সহযোগিতা, ও.আই.সি, উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়, আন্তর্জাতিক অর্থ ও বাণিজ্য সম্পর্কীত বিষয় আঞ্চলিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। এক্ষেত্রে নম্বর বন্টনঃ বর্ণনাধর্মী রচনামূলক-৬০, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, মাল্টিপল প্রশ্ন-৪০ মোট -১০০।

ঙ) সাধারণ গণিত এবং দৈনন্দিন বিজ্ঞানঃ সাধারণ গণিতের অন্তর্ভুক্ত এসএসসি সমমানের পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি। দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞান বিষয়। উপর্যুক্ত আবশ্যিক বিষয়গুলি ছাড়াও চারটি গ্রুপে বিভক্ত মোট ৬৪টি বিষয় রয়েছে লিখিত পরীক্ষার জন্য, যা থেকে মোট তিনটি বিষয় ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নির্বাচনের সুযোগ রয়েছে। এখানে নীতিটি হল, এই ৩০০ নম্বরের তিনটি বিষয়ের ক্ষেত্রে এক গ্রুপ থেকে সর্বোচ্চ দুটি বিষয় নির্বাচন করা যাবে। নিম্নে গ্রুপ ভিত্তিক ঐচ্ছিক বিষয়গুলি নাম উল্লেখ করা হল-(পরিমার্জিত, রহমান; ১৯৯৩ঃ৫৩২-৫৩৪)।

চ) গ্রুপ-১-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হলো ঃ বাংলা, ইংরেজী, আরবী সাহিত্য, পার্সী, সংস্কৃত, পালি, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃত, আরবী, দর্শন। গ্রুপ ২-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হলো ঃ ভূগোল, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ কল্যাণ/সমাজ কর্ম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, লোক

প্রশাসন, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান। গ্রুপ ৩-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হলো ঃ পদার্থ বিদ্যা, ফলিত পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, ফলিত রসায়ন, গণিত, ভূ-তত্ত্ব, জীব বিজ্ঞান, প্রাণী বিদ্যা, ফার্মেসী, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, বিদ্যুৎ প্রকৌশল। গ্রুপ ৪-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হলো ঃ হিসাব রক্ষণ, ফাইনান্স/অর্থ বিজ্ঞান, মার্কেটিং, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা প্রশাসন, আইন, আন্তর্জাতিক আইন, মেডিসিন ও প্যাথলজি, ফিজিওলজি ও এনাটমী, দন্ত বিজ্ঞান, কৃষি, অর্থনীতি, কৃষি প্রকৌশল, পশু পালন বিদ্যা, পশু চিকিৎসা বিদ্যা, মৎস্য, সমুদ্র বিজ্ঞান, বন, প্রকৌশল, যন্ত্র প্রকৌশল, রসায়ন প্রকৌশল, মেটালার্জিকাল প্রকৌশল, স্থাপত্য, নৌ-স্থাপত্য ও সুমদ্র প্রকৌশল, টেক্সটাইল টেকনোলজি, লেদার টেকনোলজি, কম্পিউটার বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, নগর উন্নয়ন ইত্যাদি সর্বমোট৬৪টি ঐচ্ছিক বিষয়।

ছ) লিখিত পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্ন করার দায়িত্ব দেয়া হয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিষয়-বিশেষজ্ঞদের। প্রত্যেক বিষয়ের প্রশ্নপত্র কমপক্ষে সাতজন প্রশ্নকারীর কাছ থেকে নেওয়া হয়। সকল প্রশ্ন থেকে বাছাই করে মূল প্রশ্নপত্রটি তৈরী করা হয়। লিখিত পরীক্ষায় গড়ে ৪৫% বা তদূর্ধ্ব নম্বর প্রাপ্ত পরীক্ষার্থী পরবর্তী পর্যায়ের জন্য উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হন।

৫.৫ মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা

মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। বিদেশী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা আমাদের দেশের পরীক্ষা পদ্ধতির উপযোগী কৌশলে এই পরীক্ষা পরিচালনা করেন কমিশনের নিজস্ব মনোবিজ্ঞানীগণ। মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার দু'টি ভাগ- লিখিত ও মৌখিক। উভয় ক্ষেত্রে ৫০ করে মোট ১০০ নম্বর নির্ধারিত। এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থীর বোধশক্তি, ইচ্ছা, প্রবণতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, প্রকাশ ক্ষমতা, বিশেষ ক্ষমতা ইত্যাদি ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত গুণাবলী যাচাই করা হয়। এই পরীক্ষায় প্রার্থীকে উত্তীর্ণ হবার জন্য ৪০% ভাগ নম্বর পেতে হয়।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল প্রার্থীকে এই পরীক্ষায় আহ্বান করা হয়। মোট ২০০ নম্বরের উপর মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই মৌখিক পরীক্ষা পরিচালিত হয় সাক্ষাৎকার বোর্ডের মাধ্যমে। প্রার্থীদের সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বোর্ড গঠিত হয় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য। সাক্ষাৎকার বোর্ড গঠিত হয় ৪/৫ জন সদস্য নিয়ে। বোর্ডের প্রধান চেয়ারম্যান, যিনি সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য। একজন সদস্য থাকেন মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় প্রতিনিধি বা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মনোনীত যিনি একজন যুগ্ম সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা। বিভিন্ন বিষয়-বিশেষজ্ঞ থাকেন একজন এবং একজন থাকেন মনোবিজ্ঞানী। বোর্ড সদস্য এই মনোবিজ্ঞানী কর্ম কমিশনের সদস্যও হতে পারেন আবার কমিশন বহির্ভূতও হতে পারেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার নির্ধারিত নম্বর ৪০%। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীর বিবেচনায় প্রার্থীকে অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে। মনোবিজ্ঞানীর

বিবেচনায় অনুত্তীর্ণ প্রার্থী যত নম্বরই মৌখিক পরীক্ষায় লাভ করুন, তিনি পরবর্তী পর্যায়ের জন্য নির্বাচিত হবেন না। পূর্বোক্ত পরীক্ষা সমূহের পর বি. সি. এস. নিয়োগ বিধি ১৯৮১-এর ৪(৩) (ক) ধারানুযায়ী মেডিকেল বোর্ড গঠন করে প্রার্থীদের শারীরিক যোগ্যতা যাচাই করা হয়।

এই সামগ্রিক পরীক্ষণ প্রক্রিয়া সমাপ্তির পর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর আবেদনকারীর অগ্রাধিকার এবং সরকার নির্ধারিত কোটা বিধি অনুসারে সরকারী কর্মকমিশন প্রার্থীদের ক্যাডার ভিত্তিক মেধা তালিকা প্রস্তুত করে এবং সুপারিশসহ নির্ধারিত প্রার্থীদের তালিকা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। কর্মকমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রার্থী তালিকা পাবার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি যেমন নৈতিক শৃঙ্খলাজনিত অপরাধ, সামাজিক শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত মামলা, আদালত কর্তৃক দন্ড ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়, বিসিএস নিয়োগ বিধি ১৯৮১ এর ৪(৩) ধারায়। সন্তোষজনক পুলিশী রিপোর্ট পাবার পর সংস্থাপন মন্ত্রণালয় প্রার্থী তালিকা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করে। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাবার পর সংস্থাপন মন্ত্রণালয় নির্বাচিত প্রার্থীদের কাছে নিয়োগপত্র প্রেরণ করে। প্রার্থীদের কর্মে যোগদানের দিন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের নিয়োগের গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। নিয়োগের এ পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী নিয়োগপত্র দেয়া হয় শিক্ষানবীস হিসেবে। এই শিক্ষানবিসীর মেয়াদ দুই বৎসর। এ পর্যায়ে বিভিন্ন ক্যাডারের জন্য নির্বাচিত কর্মকর্তাগণকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চার মাস ব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হয়।

৬.০ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ ক্ষেত্রে সমস্যা

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগের সরাসরি পদ্ধতি তথা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে কিছু সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্যাগুলিকে আমরা ২টি বৃহৎ দিক থেকে আলোচনা করতে পারি,১। তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত ও নীতিগত পরিপ্রেক্ষিত এবং পদ্ধতিগত পরিপ্রেক্ষিত।

৬.১ ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ ক্ষেত্রে সমস্যাঃ তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত

নিয়োগ ও নির্বাচনের তাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে সমস্যাটি হলো এখানে দীর্ঘমেয়াদী কোন কর্মচারী পরিকল্পনার অধীনে এই সকল নিয়োগ নির্বাচন সম্পন্ন হয় না। এই নিয়োগের কোন দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য নেই। তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যেই এই নিয়োগ পদ্ধতি কার্যকর। ফলে অনেক ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। অনেক সময় চূড়ান্ত প্রার্থী নিয়োগের সুপারিশের পরও মন্ত্রণালয় থেকে তার সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করণের অনুরোধ করা হয় কর্মকমিশনের কাছে। (বাংলাদেশ

সরকারি কর্মকমিশন;১৯৯১ঃ ২৭)। এমন কি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর থেকে শূন্য পদ পূরণের জন্য দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞপ্তি জারীর পর সেই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে কর্মী নিয়োগ না করারও উদাহরণ রয়েছে (বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন; ১৯৯১ঃ২৭)। তাত্ত্বিক দিক থেকে নিয়োগ পদ্ধতিতে এটি বড় ধরনের ত্রুটি।

৬.২ সংরক্ষিত পদঃ কোটা পদ্ধতি

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে প্রথম শ্রেণীর ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগ ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এখানে মেধা ভিত্তিক নিয়োগের পাশাপাশি কোটা ভিত্তিক নিয়োগের উপস্থিতি। অবশ্য কোটা ব্যবস্থায় ও কোটার অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীরা মেধাক্রমানুসারেই নিয়োগের সুযোগ লাভ করে। মোট নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে কোটা পদ্ধতি রয়েছে তা পরবর্তী ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬.৩ মুক্তিযোদ্ধা কোটা

বি.সি.এস পরীক্ষায় নিয়োগ ক্ষেত্রে প্রচলিত এই পদসংরক্ষণ ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে ত্রুটি মুক্ত বলে অভিহিত করা যায় না। প্রথমত, স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পর সর্বোচ্চ ৩২ (বত্রিশ) বছর বয়সসীমায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পদ সংরক্ষণ কোনভাবেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। কারণ, এখন কারও বয়স বত্রিশ হলে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। সেক্ষেত্রে তার পক্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বি.সি.এস পরীক্ষায় কখনোই মুক্তিযোদ্ধা কোটায় সম্পূর্ণ নিয়োগ দেয়া যায়নি। বিগত ক'বছরে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগের অবস্থা দেখানো হলোঃ (বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন, ১৯৯৫ ঃ ১৭)

সারণী ১ঃ বিভিন্ন সনে অনুষ্ঠিত বিসিএস পরীক্ষায় মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা

বিসিএস পরীক্ষার নং	সন	প্রাপ্য পদের সংখ্যা	প্রাপ্ত পদের সংখ্যা	মুক্তিযোদ্ধা কোটায় সুযোগ পাবার % হার	নির্ধারিত কোটার % হার
৭ম	১৯৮৫	৭৫৯	১২২	১৬.১	৩০
৮ম	১৯৮৬	৬৮৬	৩০	৪.৪	৩০
৯ম	১৯৮৮/৮৯	৩৫০	১৩	৩.৭	৩০
১০ম	১৯৮৯/৯০	৩৬০	১	০.০৩	৩০
১১শ	১৯৯০/৯১	৩৭৩	০	০	৩০
১৩শ	৯১-৯২	৪১৫	২	০.৫	৩০
১৪শ	১৯৯২	৫৯১	২	০.৩	৩০
১৫শ	১৯৯৩-৯৪	৩৩২	০	০	৩০
১৬শ	১৯৯৫	৪১০	১	০.২	৩০

এক্ষেত্রে এর পর মুক্তিযোদ্ধা কোটায় প্রার্থী পাবার কোন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

৬.৪ জেলা কোটা

বিসিএস পরীক্ষায় নিয়োগকৃত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মেধা সংকটের আরেকটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে জেলা কোটার কারণে। এই জেলা কোটার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই স্বল্প মেধা সম্পন্ন প্রার্থী নিয়োগের সুযোগ পাচ্ছেন অধিকতর মেধা সম্পন্ন প্রার্থীর চেয়ে। কারণ, এখানে যেহেতু বিভিন্ন জেলার জন্য নিয়োগ এর নির্দিষ্ট কোটা রয়েছে, তাই কোন জেলার জন্য নির্দিষ্ট পদ জেলার স্থায়ী অধিবাসী কর্তৃকই শুধু পূরণ হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগে জেলা কোটা জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত রয়েছে। তা নিম্নরূপ (মিয়া; ১৯৯২ঃ১১৭-২২০)ঃ

সারণী ২ঃ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে মোট পদের ভিত্তিতে বিভিন্ন জেলার জন্য নির্ধারিত পদ সংখ্যার % হার

জেলা	কোটার % হার	জেলা	কোটার % হার	জেলা	কোটার % হার	জেলা	কোটার % হার
১। ঢাকা	৫.৫৯	১৮। চট্টগ্রাম	৫.২২	৩৫। নবাবগঞ্জ	১.১০	৫২। যশোহর	১.৯৯
২। গাজীপুর	১.৫৫	১৯। কক্সবাজার	১.৩৩	৩৬। নাটোর	১.২৩	৫৩। ঝিনাইদহাহ	১.২৭
৩। মানিকগঞ্জ	১.১০	২০। বান্দরবন	০.২২	৩৭। দিনাজপুর	২.০৮	৫৪। মাগুরা	০.৬৮
৪। মুন্সিগঞ্জ	১.১১	২১। খাগাজাছড়ি	০.৩৩	৩৮। ঠাকুরগাঁও	০.৯৩	৫৫। নড়াইল	০.৬২
৫। নারায়নগঞ্জ	১.৬৬	২২। রাঙ্গামাটি	০.৩৮	৩৯। পঞ্চগড়	০.৬৭	৫৬। কুষ্টিয়া	১.৪০
৬। নরসিংদী	১.৫৬	২৩। কুমিল্লা	৩.৮৭	৪০। রংপুর	২.০১	৫৭। চুয়াডাঙ্গা	০.৭৫
৭। ফরিদপুর	১.৪১	২৪। ব্রাহ্মনবাড়িয়া	২.০৫	৪১। নীলফামারী	১.২৮	৫৮। মেহেরপুর	০.৪৬
৮। রাজবাড়ী	০.৭৮	২৫। চাঁদপুর	১.৯৫	৪২। কুড়িগ্রাম	১.৪৮	৫৯। বরিশাল	২.০৯
৯। গোপালগঞ্জ	০.০১	২৬। নোয়াখালী	২.১৪	৪৩। গাইবান্ধা	১.৭৭	৬০। ভোলা	১.৩৬
১০। মাদারীপুর	১.০১	২৭। ফেনী	১.০৫	৪৪। লালমনিরহাট	০.৮৮	৬১। ঝালকাঠি	০.৬৩
১১। শরিয়তপুর	০.৯০	২৮। লক্ষীপুর	১.২৬	৪৫। বগুড়া	২.৪৫	৬২। পিরোজপুর	১.০০
১২। জামালপুর	১.৭৬	২৯। সিলেট	২.০৭	৪৬। জয়পুরহাট	০.৭০	৬৩ পটুয়াখালী	১.১৮
১৩। শেরপুর	১.০৫	৩০। হবিগঞ্জ	১.৪২	৪৭। পাবনা	১.৭৮	৬৪। বরগুনা	০.৭২
১৪। ময়মনসিংহ	৩.৬৫	৩১। মৌলবীবাজার	১.৩২	৪৮। সিরাজগঞ্জ	২.১৪		
১৫। কিশোরগঞ্জ	২.০৭	৩২। সুনামগঞ্জ	১.৬১	৪৯। খুলনা	১.৯৪		
১৬। নেত্রকোনা	১.৫৯	৩৩। রাজশাহী	১.৮১	৫০। সাতক্ষীরা	১.৫১		
১৭। টাংগাইল	২.৭৭	৩৪। নওগাঁ	১.৯৬	৫১। বাগেরহাট	১.৩৪		

এই কোটা ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষাকৃত অগ্রসর জেলাগুলির প্রার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগ বঞ্চিত হচ্ছেন তুলনামূলকভাবে অধিক মেধা সম্পন্ন হবার পরও। ১৯৯৩-৯৪ সালে অনুষ্ঠিত ১৫শ বি. সি. এস পরীক্ষার বিভিন্ন ক্যাডারের নিয়োগ প্রাপ্ত প্রার্থীদের ফলাফল দিয়ে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে ঃ (বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন; ১৯৯৫:১৪)

সারণী ৩ঃ সাধারণ ক্যাডারে মেধা ও জেলা কোটা ভিত্তিক পদ প্রাপ্তির তুলনামূলক বিবরণ

ক্যাডার	মেধা কোটায় পদের সংখ্যা	মেধা কোটয় প্রাপ্ত সর্ব নিম্ন মেধাক্রম	জেলা কোটায় পদের সংখ্যা	জেলা কোটায় প্রাপ্ত সর্ব নিম্ন মেধাক্রম
পররাষ্ট্র	৭	৭	৯	১৭৫
প্রশাসন	৫৬	১২০	৬৯	৩০৬৬
কর	১৪	১৭৯	১৬	২২৬১
হিসাব ও নীরিক্ষা	১০	১৯৪	১২	৩০৪০
শুল্ক ও আবগারী	৭	৩৯	৮	৬২১
তথ্য (সাধারণ)	৬	১৫৫	৮	৩১১৭
ডাক	১৩	২৫৩	১৬	৪১৮
পুলিশ	৩৪	১৮৩	৪১	১৬৪০
সমবায়	৩	২৫৯	৩	৪১১
আনসার	৮	২৮৪	১০	৩২০৫
খাদ্য (সাধারণ)	১	২২১	২	২৪১

একই সময় অর্থাৎ ১৯৯৩-৯৪ সালে ১৫শ বি.সি.এস পরীক্ষায় টেকনিক্যাল ক্যাডারে মেধা ও জেলা কোটা ভিত্তিক পদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও বিষয়টি দেখা যায় একই রকম অর্থাৎ জেলা কোটার সুযোগে সকল ক্যাডারেই তুলনামূলকভাবে অনেক নিম্ন মেধার প্রার্থী নিয়োগ পেয়ে যাচ্ছেন সহজেই। নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট হবে ঃ (বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন; ১৯৯৫: ১৬)।

সারণী ৪ঃ টেকনিক্যাল ক্যাডারে ১৫শ বিসিএস পরীক্ষায় মেধা ও জেলা কোটায় নিয়োগ প্রাপ্ত প্রার্থীদের তুলনামূলক বিবরণ

ক্যাডার	মেধা কোটায় পদের সংখ্যা	মেধা কোটায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন মেধাক্রম	জেলা কোটায় পদের সংখ্যা	জেলা কোটায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন মেধাক্রম
স্বাস্থ্য	১৩২	১২৯	১৬১	৯৬০
তথ্য (কারিগরী)	২০	৫৯	২৪	২৪৩
খাদ্য (কারিগরী)	৪	২৮	৫	১৩৭
গনপূর্ত (সিভিল)	৯	৪১	১১	২০০
গণপূর্ত (তড়িৎ)	৪	৩৬	৫	৮৪
গণপূর্ত (যান্ত্রিক)	১	৫	১	১৮
কৃষি (বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)	৫	৩০	৫	৪৯
কৃষি (বিষয়বস্তু কর্মকর্তা)	৭	২১	৮	৩৪৪
অর্থনীতি (কৃষি)	৩	১৫	৪	৮৩
অর্থনীতি (অর্থনীতি)	১১	৩৯	১৪	১৬৪
অর্থনীতি (পরিসংখ্যান)	৫	৩৫	৫	২৬৮

৬.৫ উপজাতীয় কোটা

সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়েগের নীতিগত ক্ষেত্রে আরেকটি ত্রুটি হলো উপজাতীয় কোটা। উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত কোটায় তেমন কোন প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না। সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের খুব অল্প সংখ্যক জেলাতে স্বল্প সংখ্যক উপজাতীয়দের বাস। তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন না ঘটলে তাদের জন্য শুধুমাত্র পদ সংরক্ষণ নীতি প্রণয়ন করে কোন সুফল আশা করা যায় না। নীচের সারণীতে বিগত কয়েকটি বি.সি.এস পরীক্ষার উপজাতীয় কোটায় নিয়োগ প্রাপ্য ও প্রাপ্ত পদের বিবরণ দেওয়া হলো- (বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন; ১৯৯৫:১৭)

সারণী ৫ঃ বিগত কয়েকটি বিসিএস পরীক্ষায় উপজাতীয় কোটায় প্রাপ্য ও প্রাপ্ত পদের বিবরণ

বিসিএস পরীক্ষা	সন	উপজাতীয় কোটায় প্রাপ্য পদ সংখ্যা	প্রাপ্ত পদের সংখ্যা	প্রাপ্ত পদের % (প্রাপ্য পদের তুলনায়)
৭ম	১৯৮৫	১২৭	৫	৩.৯
৮ম	১৯৮৬	১০৬	১০	৯.৪
৯ম	১৯৮৮-৮৯	৫৯	৬	১০.২
১০ম	১৯৮৯-৯০	৫৭	১	১.৮
১১শ	১৯৯০-৯১	৫৩	–	–
১৩শ	১৯৯১-৯২	৬৮	১	১.৫
১৪শ	১৯৯২	৯৯	–	–
১৫শ	১৯৯৩-৯৪	৫৩	৬	১১.৩
১৬শ	১৯৯৪	৬৮	১	১.৫

৬.৬ মহিলা কোটা

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগে বর্তমান 'মহিলা কোটা' একটি ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি। এই ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির কারণেই সিভিল সার্ভিসে মহিলা প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির নীতিগত উদ্দেশ্যটি পূরণ হতে পারছেনা। কারণ সিভিল সার্ভিসের অন্যান্য কোটায় পদ সংরক্ষণের ধারণা, যেমন জেলা কোটা বা উপজাতীয় কোটা ইত্যাদি অনগ্রসর শ্রেণীকে সুযোগ দানের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মহিলা কোটা এর ব্যতিক্রম। কারণ মহিলারা পুরুষদের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে অনগ্রসর হলেও বি.সি.এস পরীক্ষায় যে অর্থে মহিলারা অংশগ্রহণ করেন, তাতে তারা সমাজের অবহেলিত মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব করেন না। কারণ বাংলাদেশের মত কৃষি নির্ভর

সামন্তবাদী অর্থনীতি ভিত্তিক একটি দেশে যে সকল মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাচ্ছেন তারা তুলনামূলক ভাবে উচ্চতর সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নিঃসন্দেহে। তাই একই যোগ্যতা একই বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ একই বিষয় অধ্যয়নের পর, এমনকি আবেদনের ক্ষেত্রে সমান যোগ্যতা নির্ধারণের পরও মহিলা কোটা পৃথকভাবে সংরক্ষণের পেছনে যুক্তি খুব স্বচ্ছ হতে পারে না। বলা যায় সামাজিক একটি এলিট গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষাই শুধু এই পদ্ধতির মাধ্যমে নিশ্চিত করা হচ্ছে। কারণ, আর্থ-সামাজিক নানা কারণেই গ্রামীণ পটভূমির একজন নারীর পক্ষে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরকারি চাকরি অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। তাছাড়া বিগত ক'বছরের বি.সি.এস পরীক্ষার নিয়োগ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে বর্তমান মহিলা কোটার মাধ্যমে মহিলাদের সিভিল সার্ভিসে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ বৃদ্ধি সম্ভব হয়নি। (সরকারি কর্মকমিশন; ১৯৯৫:১৭০)

সারণী৬ঃ বিভিন্ন সালে বি.সি.এস পরীক্ষার মহিলা কোটায় প্রাপ্য ও প্রাপ্ত পদের তুলনামূলক বিবরণ

বিসিএস পরীক্ষা	সাল	প্রাপ্য পদ সংখ্যা	প্রাপ্ত পদ সংখ্যা	প্রাপ্য পদের ও প্রাপ্তদের তুলনামূলক % হার	মহিলাদের বিশেষ কোটা ছাড়া মেধা ও জেলা কোটায় প্রাপ্ত পদের সংখ্যা (মোট পদের %)
৭ম	১৯৮৫	২৫৩	২৫৩	১০০	৯৭ (৪.৫%)
৮ম	১৯৮৬	২১২	২১২	১০০	৯৬ (৪.৫%)
৯ম	১৯৮৮/৮৯	১০৭	৮৩	৭০.৯	১০৬ (৯.০%)
১০ম	৮৯/৯০	১১৯	৪৬	৩৮.৭	৭১ (৭.০%)
১১শ	৯০/৯১	১১৯	৪৪	৩৭.০	৬০ (৮.৬%)
১৩শ	৯১/৯২	১৪১	৬২	৪৪.০	৯৮ ৯৮.৪%)
১৪শ (বিশেষ)	১৯৯২	১৯৭	১২৬	৬৪.০	৪০৩ (২১.৪%)
১৫শ	১৯৯৩	১১৪	৬৭	৫৯.০	৯৬ (১১.২%)
১৬শ (বিশেষ)	১৯৯৪	১৩৭	১১২	৮১.৮	২৯৫ (২১.৯%)

পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট যে সার্বিকভাবে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মহিলাদের মেধাগত নৈপূণ্য সন্তোষজনক নয়। কিন্তু তবুও মহিলা কোটায় পদ সংরক্ষণের কারণে মহিলারা অপেক্ষাকৃত বেশী পদ পেয়ে যাচ্ছেন। এটি যৌক্তিক নিয়োগ নীতির পরিপন্থী। সামগ্রিক বিচারে ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ ক্ষেত্রে এই কোটা ব্যবস্থা একটি মেধা সংকট সৃষ্টি করছে যাকে ক্যাডার সার্ভিসের গুণগত মানহ্রাসের একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া এই কোটা পদ্ধতি নিয়োগ ক্ষেত্রে একটি অসাম্যের সৃষ্টি করেছে যা বাংলাদেশের সাংবিধানিক নীতিমালারও পরিপন্থি। বাংলাদেশের সংবিধানে সরকারি কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত ভাষ্য হল "রাষ্ট্রের কর্ম নিয়োগ ক্ষেত্রে ধর্ম-বর্ণ-নারী: পুরুষ-জাতি-উপজাতি সবার সমান সুযোগ থাকবে--"

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান; ১৯৯৪: ২৯)। যদিও "রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সেই সুযোগ সংরক্ষণের অধিকারও রাখবে" (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান; ১৯৯৪: ২৯ (২) (গ)। অথবা "প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করবে" (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান; ১৯৯৪; ১৩৩ ধারা) বলে সাংবিধানিক ভাবেই বর্ণিত তবুও মেধা ও কোটা ভিত্তিক নিয়োগের মধ্যে যোগ্যতার বিশাল পার্থক্য এক্ষেত্রে একটি অসাম্য, একটি অবিচার, একটি অন্যায় প্রবণতাই আমাদের সামনে যেন প্রকাশ করে।

৬.৭ টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল পদপ্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারে যোগদান প্রবণতা নীতিগত প্রেক্ষিত থেকে ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ পদ্ধতিতে আরেকটি গুরুতর ত্রুটি হচ্ছে, টেকনিক্যাল বা কারিগরী শিক্ষায় ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নন-টেকনিক্যাল বা সাধারণ ক্যাডারে নিয়োগ প্রাপ্ত হবার সুযোগ উন্মুক্ত রাখা। "বর্তমান বি.সি.এস পরীক্ষার পদ্ধতি অনুযায়ী সকল ক্যাডারে একই সাথে পরীক্ষা গ্রহণের ফলে কিছু সংখ্যক টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল ক্যাডারের শূন্য পদে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রার্থী মনোনয়ন দান সম্ভব হচ্ছে না। কারণ ঐ সকল ক্যাডারের প্রার্থীগণ সাধারণ ক্যাডারের পদের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে পছন্দক্রম দিয়ে থাকেন এবং তাদের নিজস্ব ক্যাডার অর্থাৎ টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল ক্যাডারের জন্য পছন্দক্রম দিতে অনীহা প্রকাশ করেন। বা দিলেও তা সাধারণ ক্যাডারের নীচে দিয়ে থাকেন।" (বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন; ১৯৯৫:২৫)। বিগত কতগুলি বিসিএস পরীক্ষার টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল ডিগ্রী প্রাপ্ত প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারে নিয়োগের পরিসংখ্যান থেকে বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট হবেঃ (বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন; ১৯৯৫:২৬০।

সারণী ৭ঃ বিভিন্ন সালের বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ ক্যাডারে নিয়োগের জন্য সুপারিশকৃত কারিগরী ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রার্থীদের % হার।

বিসিএস পরীক্ষা	সন	সাধারন ক্যাডারে টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল প্রার্থীদের নিয়োগের % হার (টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল পদে নির্বাচিত মোট প্রার্থীর তুলনায়)
৮ম	১৯৮৬	৫.১২
৯ম	১৯৮৮	৯.০৫
১০ম	১৯৮৯	৯.২৫
১১শ	১৯৯০	১৪.৭০
১৩শ	১৯৯১	১৫.১১
১৫শ	১৯৯৩	১৭.০০

সারণীর পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে যে টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল ডিগ্রী প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারে যোগদান প্রবণতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে যা সত্যিকার

নিয়োগ পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। যে কোন নিয়োগ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহ ও তাদের যথাযথ কর্মে নিয়োগ। কিন্তু বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ ক্ষেত্রে একটি বিপরীত প্রবণতা প্রকাশ্য হওয়া সত্ত্বেও এখনো এ প্রবণতা রোধের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। নীতিগত প্রেক্ষিত থেকে এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং নিঃসন্দেহে একটি গুরুতর ত্রুটি।

৬.৮ ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ ক্ষেত্রে নূন্যতম যোগ্যতা নির্ধারণে অষ্পষ্টতা: সিভিল সার্ভিসের সাধারণ ক্যাডার পদে আবেদনের জন্য প্রার্থীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক/সম্মান বা তদূর্ধ্ব গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী প্রয়োজন। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলোর গ্রাজুয়েশন পর্যায়ের নম্বর পদ্ধতিতে শ্রেণী নির্ধারণ করা সহজ। কিন্তু টেকনিক্যাল শিক্ষার ক্ষেত্রে এই শ্রেণী নির্ধারণে অনেক সময়ই জটিলতা দেখা দেয়। কারণ এসব পরীক্ষায় কৃতিত্ব নির্ধারণ করা হয় গ্রেডিং এর মাধ্যমে। যেমন ১৯৯০/৯১ সালের বি.সি.এস পরীক্ষায় নিয়োগ প্রাপ্ত ৫জন চিকিৎসক সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফলের সাথে তুলনা করলে তৃতীয় শ্রেণীর সমমানের। টেকনিক্যাল প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারে আবেদনের যোগ্যতা নির্ধারণের বিষয়ে কোন সুস্পস্ট নীতি না থাকায় এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এটি যৌক্তিক নিয়োগ নীতির পরিপন্থি।

৭.০ ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ ক্ষেত্রে সমস্যা ঃ পদ্ধতিগত পরিপ্রেক্ষিত

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগের পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্যাগুলি নিয়োগ পদ্ধতির বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান। এই সমস্যাগুলির উপস্থিতি সামগ্রিক নিয়োগ পদ্ধতির অকার্যকারিতার জন্যও অনেকাংশে দায়ী। পদ্ধতিগত পরিপ্রেক্ষিত থেকে যে সমস্যাগুলি মূল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

৭.১ প্রিলিমিনারী টেষ্ট

এখানে বিসিএস পরীক্ষার প্রথম স্তরেই সকল আবেদনকারীর মধ্য থেকে সীমিত সংখ্যক পরীক্ষার্থী বাছাই কল্পে 'মাল্টিপল চয়েস' পদ্ধতিতে সাধারণ জ্ঞান ধর্মী প্রশ্নের ভিত্তিতে প্রিলিমিনারী টেষ্ট হয়। এক্ষেত্রে মূল অসুবিধা হলো এ ধাঁচের পরীক্ষার সাথে আমাদের দেশের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের কোন পরিচয় নেই, না প্রকৃতিগত দিক থেকে, না পদ্ধতিগত দিক থেকে। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও এই ধাঁচের পরীক্ষা বা সিলেবাসোপযোগী অধ্যয়নের সুযোগ নেই। ফলে নিজস্ব বিষয়ে কৃতী অনেক ছাত্র বা ছাত্রীও এই পরীক্ষায় মেধা প্রদর্শনে অসুবিধার সম্মুখীন এমনকি অকৃতকার্যও হতে পারে। যে ধাঁচের প্রশ্ন বা পরীক্ষা পদ্ধতিতে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুশীলন করানো হয় না, তার ভিত্তিতে বি.সি.এস

পরীক্ষার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জাতীয় পরীক্ষার কৃতকার্যতা ও অকৃতকার্যতা নির্ধারণ সাধারণ ভাবেই প্রশ্নাতীত হতে পারে না।

৭.২ মূল লিখিত পরীক্ষা

এখানে বি.সি.এস পরীক্ষার লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন খুবই বর্ণনাধর্মী। উত্তরও আশা করা হয় তেমনি। এক্ষেত্রে তাই প্রার্থীর ক্ষমতা, সৃজনশীলতা, বিষয় সম্পর্কে ধারণার স্বচ্ছতা ইত্যাদি যাচাই করার তেমন সুযোগ নেই। অথচ উন্নয়ন প্রশাসক হিসেবে এই ক্যাডার কর্মকর্তাদের যে ভূমিকা সেখানে বিশ্লেষণ ক্ষমতার তীক্ষ্নতা, অসাধারণ সৃজনশীলতা, নিজস্ব দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণার পূর্ণ স্বচ্ছতা ইত্যাদি চূড়ান্তভাবে আবশ্যক। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো আটশত নম্বরের পরীক্ষার বিশাল আয়োজন দিয়েও আমাদের দেশে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ পদ্ধতিতে সেটা নিশ্চিত করা সহজ নয়।

৭.৩ বিসিএস পরীক্ষার আবেদন ফর্ম সংক্রান্ত সমস্যা

বি. সি. এস পরীক্ষার আবেদনের ফর্ম অনেক ক্ষেত্রেই প্রার্থীদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। কারণ দুটি ভিন্ন ভিন্ন ফর্ম আবেদনকারীদের পূরণ করতে হয়। যার একটি পূরণ করার জন্য বিশেষ ধরনের পেন্সিল ব্যবহার করা প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রেই এই ফর্মের জটিল কাঠামোর জন্য এটা পূরণে অন্যের সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়া এই ফর্মে সকল আবেদনকৃত প্রার্থীর সম্পর্কে সমাজে দু'জন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির মতামত চাওয়া হয়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এই দু'জন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করে তথ্যের সত্যতা যাচাই সম্ভব নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই এই মতামত সংগ্রহ একটি দুর্নীতির সুযোগ উন্মুক্ত করে দিতে পারে; মন্তব্যকারী, মন্তব্য প্রার্থী উভয় দিক থেকেই।

৭.৪ লিখিত পরীক্ষার বিষয় সংক্রান্ত সমস্যা

যে কোন নিয়োগের একটি মৌলনীতি হলো নিয়োগ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীর মেধা যাচাই প্রক্রিয়া প্রার্থীর পদের সাথে সম্পর্কিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এ দিক থেকে বি.সি.এস ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা নিয়োগের যাচাই পরীক্ষার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি গুরুতর ত্রুটি ও অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। এই ত্রুটি ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ পরীক্ষার আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক উভয় বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এখানে ঐচ্ছিক বিষয়ের ক্ষেত্রে চারটি গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয় রয়েছে এবং আবেদনকারী প্রার্থীগণ চারটি গ্রুপের বিষয় থেকে যে কোন তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে। এক্ষেত্রে একমাত্র নির্দেশনা হলো কোন গ্রুপ থেকে দু'টির বেশী বিষয়ে পরীক্ষা দেয়া যাবেনা। এর ফলে দেখা যায় প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নিজের অধীত বিষয় না নিয়ে অধিক নম্বর তোলার জন্য সম্মান শ্রেণীর অধ্যয়নের সাথে সম্পর্কহীন বিষয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে বা দিতে বাধ্য হচ্ছে। বিগত

বি.সি.এস পরীক্ষাগুলির প্রার্থীদের শিক্ষাগত পটভূমি বিশ্লেষণে দেখা যায়। এই পরীক্ষার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং টেকনিক্যাল কলেজগুলির সম্মানসহ স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের আবেদনকারীর সংখ্যাই বেশী। নীচের সারণীতে বিগত তিনটি বিসিএস পরীক্ষার সাধারণ ক্যাডারে নিয়োগ প্রাপ্ত প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার একটি বিবরণ দেয়া হলো ঃ (বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন; ১৯৯৫ঃ৬৭-৬৮)।

সারণী ৮ঃ বিগত কয়েকটি বি.সি.এস পরীক্ষায় নিয়োগ সুপারিশ প্রাপ্ত প্রার্থীদের শিক্ষাগত পটভূমি

বিসিএস পরীক্ষা	সন	স্নাতক	স্নাতক সম্মান	স্নাতক চিকিৎসা	স্নাতক প্রকৌশলী	সর্বমোট
১১শ	১৯৯০-৯১	১০.১%	৮১.২%	২.৮%	৬.৩%	১০০
১৩শ	১৯৯১-৯২	৮.৩%	৮৫.৯%	১.৬%	৪.৩%	১০০
১৫শ	১৯৯৩-৯৪	২০.১%	৭৫.৪%	১.১%	৪.৫%	১০০

সারণীতে দেখা যাচ্ছে তিনটি বি.সি.এস পরীক্ষাতেই স্নাতক সম্মান পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রশ্নাতীত। স্নাতক সম্মান পর্যায়ে যেহেতু বিষয়ের ক্ষেত্রে স্পেশিয়ালাইজেশন হয়, তাই এখানে সম্মান বিষয় সম্পর্কিত কোর্সই প্রধান থাকে এবং প্রাধান্য পায়। কিন্তু সম্মান শ্রেণীর অধীত কোর্সগুলি পরীক্ষার জন্য পিএসসি কর্তৃক নির্বাচন না করাতে আবেদনকারীরা বাধ্য হচ্ছেন অন্য কোর্স নিতে। এতে সত্যিকার মেধা যাচাই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া নিয়োগ পদ্ধতির একটি মৌল নীতি হল কার্যের সাথে প্রাসঙ্গিক ও উপযুক্ত পরীক্ষণের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট পদের বা সার্ভিসের লক্ষ্যে প্রার্থীর যোগ্যতা যাচাইকরণ। নিয়োগের এই মৌল নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এস.এস.সি সমমানের ষ্টান্ডার্ডে বাধ্যতামূলক ভাবে গণিত বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের যৌক্তিকতা খুঁজে যাওয়া যায় না।

৭.৫ ক্যাডার সিলেকশনে প্রার্থীর প্রাধান্য

নিয়োগ নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি মৌল বিষয় হলো বিভিন্নধর্মী বহুবিধ প্রক্রিয়াতে কর্মীর সক্ষমতা যাচাই বাছাই-এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট পদের জন্য উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ। কিন্তু বি.সি.এস পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নিয়োগ এক্ষেত্রে স্বয়ং প্রার্থীদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়। বর্তমান পদ্ধতিতে ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত হবার ক্ষেত্রে প্রার্থীদের মনোভাবই মূলত প্রাধান্য পায়। যার কারণে বি.সি.এস পরীক্ষার মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেও সাধারণভাবে আবেদনকারীদের দ্বারা অপেক্ষাকৃত নিম্ন পছন্দের ক্যাডারে যাবার উদাহরণও আছে। এছাড়া যে ক্যাডারের নাম মূল আবেনদপত্রে প্রার্থী উল্লেখ করবেন না, সে ক্যাডারের জন্য প্রার্থীকে বিবেচনা করা হয় না। এর ফলে প্রার্থী উল্লিখিত ক্যাডারে সুযোগ না পেলে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার সন্তোষজনক দক্ষতা প্রদর্শন করার পরও নিয়োগ না পাবার সম্ভাবনা থাকে।

এটি নিয়োগের পদ্ধতিগত দিক থেকে একটি গুরুতর ত্রুটি। কারণ, বিভিন্ন স্তর পার হয়ে একজন প্রার্থী সাক্ষাৎকার পর্বের জন্য নির্বাচিত হন এবং একটি বিশেষজ্ঞ বোর্ড তার উপযুক্ততা নির্ধারণ করে প্রার্থীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতির মাধ্যমে। এক্ষেত্রে একজন প্রার্থী কোন্ ক্যাডারের জন্য উপযুক্ত তা নির্ধারণে বোর্ডের ভূমিকা থাকা উচিৎ এবং সেটিই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণ একজন প্রার্থীর ক্যাডার পছন্দের আবেগ, উচ্চাশার বিপরীতে বোর্ডের বিবেচনাবোধ ও যৌক্তিকতার সম্ভাবনা বেশী থাকবে। তাতে সুষ্ঠু মেধা বন্টনের অধিক সুযোগও সৃষ্টি হবে।

৭.৬ মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা

যে কোন নিয়োগ পদ্ধতিতেই মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। কারণ নিয়োগের এই স্তরেই প্রার্থীর ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিজ্ঞান ভিত্তিতে নির্ধারণ করা সম্ভব। মেধার পাশাপাশি এ সকল গুণাবলী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার মাধ্যমেই ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্রুততা, নেতৃত্বগুণ, উপস্থিত বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, মনোভাব প্রভৃতি আবশ্যকীয় গুণাবলী পরিমাপ করা যায়। কর্মচারী ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রশাসন পরিপ্রেক্ষিত থেকে এগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ। মেধা তালিকা প্রণয়নে এ সকল গুণাবলীর মূল্যায়ন হওয়া খুবই জরুরী। কিন্তু ক্যাডার কর্তকর্তাদের নিয়োগ ক্ষেত্রে এখানে এই পরীক্ষা যথাযথ গুরুত্ব পায়নি এমনকি প্রার্থীর সামগ্রিক মেধা স্থান নির্ণয়ে এই পরীক্ষার নম্বরও অন্যান্য পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করা হয় না। নিয়োগের পদ্ধতিগত প্রেক্ষিত থেকে এটি একটি গুরুতর ত্রুটি।

৮.০ সুপারিশ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ পদ্ধতি অধিকতর কার্যকর করার জন্য নিম্নে কতিপয় সুপারিশ প্রস্তাব করা হল ঃ

নীতিগত পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কিত সুপারিশ

ক) মুক্তিযোদ্ধা কোটা ঃ ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ পদ্ধতিতে কোটা বা পদ সংরক্ষণ নীতি পূনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা কোটা অবলুপ্ত করা প্রয়োজন। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় সংরক্ষিত পদগুলি মেধা কোটা এবং অন্যান্য কোটার সাথে একীভূত করা যেতে পারে।

খ) উপজাতীয় কোটা ঃ উপজাতীয় কোটাটিকে বহাল রাখা হলেও যে ক্ষেত্রে এই কোটায় সম্পূর্ণ পদ পূরণ করা সম্ভব হবে না, সে ক্ষেত্রে অতিরিক্তি পদগুলি মেধা কোটার সাথে একীভূত করার পক্ষে সুস্পষ্ট নীতি প্রণয়ন করা যেতে পারে।

গ) মহিলা কোটা ঃ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগে মহিলা কোটার বর্তমান পদ্ধতিটি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বিগত ক'টি বি.সি.এস পরীক্ষার পরসিংখ্যান থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, মহিলা কোটায় পদ সংরক্ষিত রাখা হলেও

প্রাপ্তপদ পূরণ করা যায়নি, তাই মহিলা নিয়োগের হার আশানুরূপ রাখতে মহিলাদের ক্ষেত্রে বরং পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মানদন্ড পূনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন মহিলা প্রার্থীদের বয়সের সীমা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ বছর পর্যন্ত করা যেতে পারে, ইত্যাদি।

ঘ) জেলা কোটা ঃ বর্তমান জেলা কোটা সম্পর্কিত নীতিও পূনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারণ নিয়োগ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষার সাথে সাথে মেধার পৃষ্ঠপোষকতা করাও জরুরী। মেধা ভিত্তিক নিয়োগের হার ৪৫% ভাগ থেকে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

ঙ) টেকনিক্যাল এবং প্রফেশনাল ডিগ্রী প্রাপ্ত যে সকল প্রার্থী সাধারণ ক্যাডারে যোগদানে ইচ্ছুক তাদের পরীক্ষা পাশের মানদন্ড সাধারণ ডিগ্রী প্রাপ্ত প্রার্থীদের সমমানের হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। সাধারণ ডিগ্রী প্রাপ্ত প্রার্থীদের পরীক্ষায় আবেদনের জন্য স্থিরকৃত মানের চেয়ে কম যোগ্যতা সম্পন্ন টেকনিক্যাল ডিগ্রী প্রাপ্ত প্রার্থী যেন সাধারণ ক্যাডারে নিয়োগ না পেতে পারে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৮.২ বি.সি.এস পরীক্ষার পদ্ধতিগত প্রেক্ষিত সংক্রান্ত সুপারিশ

ক) প্রিলিমিনারী টেষ্ট ঃ বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারী টেষ্টের পদ্ধতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সাধারণজ্ঞান মূলক এম. সি. কিউ পদ্ধতির পরিবর্তে আবেদনকারী প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচিত ঐচ্ছিক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। এই পরীক্ষায় ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকবে এবং প্রতিটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরের জন্য স্থান নির্দিষ্ট থাকবে। ২০থেকে ২৫টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য বর্তমান প্রিলিমিনারী পরীক্ষার মতই এক ঘন্টা সময় নির্ধারিত থাকবে। এই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর মূল পরীক্ষার সাথে যোগ হবে। ফলে মেধা বিচারের মানদন্ড অধিকতর সুষ্ঠু হবে এবং প্রার্থীদের নির্বাচন পদ্ধতি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হবে।

খ) প্রার্থীর ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে নির্দিষ্ট বিষয়গুলি রয়েছে তার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্নাতক সম্মান এবং মাষ্টার্স শ্রেণীর অধীত কোর্সগুলিও পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। অন্যান্য টেকনিক্যাল এবং নন-টেকনিক্যাল প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও তাদের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধীত কোর্সগুলির মধ্য থেকেই যেন ঐচ্ছিক বিষয়ের পছন্দক্রম নির্ধারণ করা যায়, সে ব্যবস্থা থাকা দরকার। এবং সকল ক্ষেত্রেই প্রার্থীর স্নাতক, সম্মান বা মাষ্টার্স ডিগ্রীর অন্তর্ভুক্ত কোর্সগুলি থেকেই যেন ঐচ্ছিক বিষয়গুলি নির্বাচন করা যায় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতি থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মন্তব্যটি খুবই উল্লেখযোগ্য " The written papers should offer a wide choice of subjects of all disciplines that are being taught in our universities

and abroad...there should be a few compulsory papers..." (Report of the Pay of Services Commission; 1977 : 206)

গ) ক্যাডার নির্ধারণ প্রক্রিয়াটি প্রার্থীর ব্যক্তিগত পছন্দের প্রাধান্যের ভিত্তিতে না হয়ে লিখিত, মনস্তাত্ত্বিক ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে কর্মকমিশন কর্তৃক নির্বাচিত বোর্ডের সিদ্ধান্ত ভিত্তিক হওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

ঘ) মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বর মূল মেধাক্রম নির্ধারণের সময় অবশ্যই যোগ করা প্রয়োজন।

৯.০ উপসংহার

বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশে সরকারের ভূমিকা, দায়িত্ব প্রভৃতির গুরুত্ব বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। সম্পদের সীমাবদ্ধতা, প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা, ব্যক্তিখাতের আশানুরূপ বিকাশের অভাব এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্র থেকে উত্থিত কারণে এখানে উন্নয়নে সরকারই প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকার জন্য প্রয়োজন একটি দক্ষ লোক প্রশাসন। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে উচ্চতর পর্যায়ে ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ-নির্বাচন স্বতন্ত্র গুরুত্ব বহন করে। কিন্তু বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের উচ্চতর পর্যায়ের ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে এখনও নানা ধরনের সমস্যা রয়ে গেছে। "... it is extremely important to formulate a clearly defined recruitment policy for the public services, taking into consideration the vital issues of implementing the goals of equal employment opportunity, as well as securing the sociological and geographical representation of nation's population." (Khan & Zafarullah; 1984:11) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ সম্পর্কে অধ্যাপক খান এবং জাফরুল্লাহ এ মন্তব্য করেছিলেন প্রায় একযুগ আগে। কিন্তু নীতিগত ক্ষেত্রে নানা সংস্কার, পরিবর্তন সংযোজন ও বিয়োজনের পরও বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের উচ্চতর পর্যায়ের ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগ পদ্ধতিতে এখনো অনেক সমস্যা রয়ে গেছে। দেশে দক্ষ একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে সরকারের উচ্চতর নিয়োগ ও নির্বাচন ক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যাগুলির সমাধান প্রয়োজন।

তথ্য নির্দেশ

বাংলা

১। *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,* ১৯৯৪, ঢাকা, বাংলাদেশ সরকারী ছাপাখানা।

২। মিয়া, মোহাম্মদ ফিরোজ ১৯৯৪, *চাকরীর বিধানাবলী,* ঢাকা, রোদ্দুর, ৬ষ্ঠ সংস্করণ।

৩। রহমান, এম, শামসুর ১৯৯৪, আধুনিক লোক প্রশাসন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, প্রথম পুণর্মুদ্রণ।

৪। সংস্থাপন মন্ত্রনালয়, ১৯৮১, *বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা ১৯৮১,* বাংলাদেশ সরকার।

৫। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, *নোটিফিকেশন নং* এমই আর/এর/-১/এস-১৩/৮৪-১৪৯ (২০০) তাং ২৮/৭/১৯৮৫।

৬। সরকারী কর্মকমিশন, ১৯৯১, *বার্ষিক প্রতিবেদন।*

৭। সরকারী কর্মকমিশন, ১৯৯৫, *বার্ষিক প্রতিবেদন।*

ইংরেজী

1. Ahmed Syed Giasuddin (1990). *Bangladesh Public Service Commission.* Dhaka. The Universiy of Dhaka. Bangladesh.
2. Cabinet Division (1977). *Report of the Pay & Services Commission (PSC). GOB. VOI-1. ChaphX.*
3. Decenzo. David A & Robbins. S. P (1993). *Personnel Human Resource management.* Prentice-Hall of India Ltd. New Delli. 3rd ed.
4. Flippo. Edwin B (1976). *Principles of Personnel Management.* Mc Graw-Hill Book Company. New Yourk. USA. 4th ed.
5. Hawk. Roger H (1967). *The Recruitment Function. American Management Association.* New York. (Collected from Decenzo; opcit;).
6. Heneman & Dyer (1980). *Personnel: Human Resource Management* Rechard D IRWIN. inc. Homewood. Illinois. USA.
7. Khan. M. M & Zafarullah. H. M (1984). *Recruitment & Selection In the Higher civil Services of Bangladesh: An Overview.* SICA oocational paper series. No-6. University of Texas. USA.
8. Ministry of Establishment (1982). *Bangladesh Civil Service (Age. Qualification & Examination for Direct Recruitment) rules. GOB.*
9. Public Service Commission Secretariat. *Detailed Syllabus For BCS Examination.* (REvised upto-1994). Bangladesh Government Press. Dhaka.
10. World Bank (1996). *Bangladesh Government That works-Reforming the Public Sector. Draft Report No-15182 BD. Private Sector Development & Finance Division.* Country Department 1-South Asia region.